

কুরআনের কাছে ফিরে আসা

সংকলিত



প্রতিবেশনায়ঃ Misconception About Islam
প্রতিবেশনায়ঃ Misconception About Islam

কুরআনের কাছে ফিরে আসা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি এবং তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। তাঁরই নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। তাঁরই কাছে তওবা করছি। তাঁরই কাছে আমাদের নফসের অমঙ্গল এবং মন্দ আমল হতে আশ্রয় চাচ্ছি।

আল্লাহ তাআলা যাকে হিদায়েত দান করেন কেউ তাকে পথ ভ্রষ্ট করতে পারে না আর যাকে গোমরাহ করেন তাকে কেউ হিদায়াত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল।

কুরআন কেন পড়ব?

الرَّكَتَبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

“আলিফ লাম রা; এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি- যাতে আপনি মানুষকে তাদের রবের অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন - পরাক্রান্ত, প্রশংসার যোগ্য সন্তার পথের দিকে।” (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ১)

কুরআনের এই আয়াত পড়ে ইসলামের কোন সমালোচক প্রশ্ন করতে পারেন কুরআনের এই কথাগুলো কি সত্য? কিন্তু মুসলিমদের বাস্তব অবস্থার সাথে এই কথার কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায়না। মুসলিমরা অন্ধকারেই বসবাস করছে। অবশ্যই আল্লাহর বাণী সত্য, এতে কোন সন্দেহ নেই। কেউ যদি কুরআনের ইতিহাস অধ্যয়ন করে এবং পূর্ববর্তীদের উপর কুরআনের প্রভাব প্রত্যক্ষ করে তবে দেখবে কুরআনের এই বাণী সত্যে পরিণত হয়েছিল। এটা সত্যিই দুঃখজনক যে আজকের মুসলিমরা এই অসাধারণ গ্রন্থের অধিকারী হয়েও এ থেকে হেদায়েতের নুর পাচ্ছেনা। এর কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যায় কুরআনকে মূল্যায়ন ও বুঝতে না পারার মধ্যেই সমস্যা নিহিত।

কুরআন এই পৃথিবী ও আখেরাতে মুমিনের জন্য সম্মান বয়ে আনে।

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

“আমি তোমাদের প্রতি একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি; এতে তোমাদের জন্য উপদেশ রয়েছে। তোমরা কি বোঝ না?” (সূরা আমবিয়া, ২১:১০)

এই আয়াতটি আরবের কুরাইশদের উপর নাজিল হয়েছিল। কুরআন নাজিলের আগে কেউ তাদের সম্মান দিতনা। কিন্তু কুরআনের কারণেই তাদের সম্মান বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মূলনীতি এখনও অপরিবর্তিত। যেমনটি রাসূল (সা) বলেছেন: “আল্লাহ তাঁর এই কিতাব দ্বারা কিছু লোককে উপরে উঠান আর কিছু লোককে নামিয়ে দেন নিচে।” (মুসলিম)

কোন মুমিন যদি সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে চায় এবং অন্যের চোখে নিচু হতে না চায় তবে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন তাদের কি করতে হবে: কুরআনের কাছে ফিরতে হবে এবং এর শিক্ষাকে জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। এতো গেল দুনিয়ার সম্মান। আখেরাতেও কুরআন মুমিনদের জন্য সম্মান বয়ে আনবে। আবি উমামা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি: “তোমরা কুরআন পাঠ কর। কিয়ামতের দিন কুরআন তার সাথীদের জন্য সুপারিশকারী হিসেবে উপস্থিত হবে।” (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, “সকল কথার উপর আল্লাহর বাণীর শ্রেষ্ঠত্ব ঠিক সেরকম, যেমন সকল সৃষ্টির উপর আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব।” (তিরমিযি)

কোন ব্যক্তি যখন এই কুরআনের প্রকৃত মর্যাদা বুঝতে পারবে তখন সে অবশ্যই নিজের কিছু সময় এর অধ্যয়নে ব্যয় করবে। কুরআনের প্রতিটা বাক্য, প্রতিটা শব্দ, প্রতিটি অক্ষর আল্লাহর পক্ষ থেকে যিনি জানেন যা কিছু গোপন ও প্রকাশ্য, যিনি সবচেয়ে জ্ঞানী, যিনি প্রবল পরাক্রমশালী ও সবকিছুর মালিক। কুরআন তাই জ্ঞানের উৎস হিসেবে অনন্য, এতে কোন ভুল নেই এবং মানুষের হেদায়েতের জন্য প্রয়োজনীয় সবই এতে বিদ্যমান। একজন মুমিনের কি কুরআন না পড়ে হাত পা গুটিয়ে রাখা মানায়?

একজন মুসলিম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে। এই ভালবাসার দাবী কুরআনকে ভালোবাসা। আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রা) বলেন, “কেউ যদি জানতে চায় সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে কিনা তবে তার দেখা উচিত সে কুরআনকে ভালোবাসে কিনা। যদি সে কুরআনকে ভালোবাসে তবে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকেও ভালোবাসে।”

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

“তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সংকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।” (সূরা আলে ইমরান, ৩:১১০)

সবচেয়ে ভালো যে কাজের আদেশ মুসলিমরা দিতে পারে তা হল তাওহীদের প্রকৃত বিশ্বাস এবং কুরআনকে ধারণ ও প্রয়োগ করা। সবচেয়ে মন্দ যে কাজের নিষেধ করতে পারে তা হল অবিশ্বাস ও কুরআন থেকে মুখ ফেরানো। যেহেতু মুসলিমরা আজ তাদের কার্যকলাপ ও চিন্তাধারার সাথে কুরআনের যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছে তাই তারা আল্লাহর প্রদত্ত মহান দায়িত্ব পালনে সক্ষম নয়। এজন্য মানবতার আজ এই অবস্থা। বর্তমান কালের সাথে কুরআন নাজিলের সময়কার পরিস্থিতির খুব একটা পার্থক্য দেখা যায়না। ধর্মনিরপেক্ষতা, বস্তুবাদ প্রভৃতি নাস্তিক দর্শনে পৃথিবী ছেয়ে গেছে। এসব মানব সৃষ্ট মতবাদ কখনোই মানুষকে সত্যিকার সুখ দিতে পারেনা, এসব মতবাদ মানবজাতিকে সঠিক পথ দেখাতে অক্ষম।

যে মুসলিম জাতি সমগ্র মানবজাতিকে পথ দেখাবে তারা আজ নিজেরাই অগণিত সমস্যায় জর্জরিত। তাদের এসব সমস্যার সমাধান কি কুরআনে দেয়া হয়নি? মুসলিমরা কুরআনে উত্তর খুঁজেনা বলেই তারা সমস্যার সমাধান পায়না। মুসলিমরা বন্ধু আর শত্রুর পার্থক্য করতেও অক্ষম হয়ে পড়েছে। মুসলিমরা সংখ্যায় এক বিলিয়নেরও অধিক (পৃথিবীর জনসংখ্যার চার ভাগের একভাগ), কিন্তু এই বিপুল পরিমাণ মুসলিম শক্তিতে দুর্বল। বিভিন্ন দেশে মুসলিম নিধন চলছে। আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? এসব প্রশ্নের উত্তর কুরআনের পাতায় পাতায় সুস্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: “এই কুরআন আল্লাহর মজবুত রজ্জু। এর এক প্রান্ত আল্লাহর হাতে, আরেক প্রান্ত তোমাদের হাতে। তোমরা যদি একে শক্ত করে ধর, তবে কখনও বিভ্রান্ত কিংবা ধ্বংস হবেনা।” (আত তারগীব ওয়াত তারহীব)

তাও কি আমরা কুরআন পড়বনা? আমরা কি অবিশ্বাসীদের পদতলে নিজেদের লুটিয়ে দেব? আমরা কি আল্লাহর বাণীর প্রকৃত মর্যাদা দেবনা?

কুরআন কেন নাযিল হয়েছে?

কোন মুসলিমের কাছে যদি প্রশ্ন করা হয় কুরআন কেন নাযিল হয়েছিল? অধিকাংশই বলবে নেকী লাভের জন্য। নেকী একটা দিক বটে কিন্তু মূলত এই উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠানো হয়নি। এর মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ

“এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে।” (সূরা ছোয়াদ, ৩৮:২৯)

অর্থাৎ কুরআন নাযিলের একটা কারণ এর অর্থ বুঝা। আমরা শুরুতেই যে কুরআনের আয়াতটি উল্লেখ করেছি তা থেকে আরো জানা যায় কুরআন নাযিলের আরেকটি কারণ অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মানুষকে জ্ঞানের আলোতে নিয়ে আসা।

কুরআন নাযিলের আরো কয়েকটি কারণ কুরআনে পাওয়া যায়। আল্লাহ বলছেন:

সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড ও সতর্কীকরণ: “বড়ই বরকতওয়ালা সেই সত্তা, যিনি নিজ বান্দার (মুহাম্মদ) প্রতি নাযিল করেছেন (সত্য মিথ্যার) মানদণ্ড (কুরআন), যাতে করে তা বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারীর ভূমিকা পালন করে।” (সূরা আল ফুরকান, ২৫:১)

মতভেদের ক্ষেত্রে মীমাংসা, বিশ্বাসীদের জন্য পথনির্দেশ ও করুণা: “আমরা তোমার প্রতি এ কিতাব এজন্য নাযিল করেছি, যেন আপনি সরল পথ প্রদর্শনের জন্য তাদেরকে পরিষ্কার বর্ণনা করে দেন, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে এবং ঈমানদারদের ক্ষমা করার জন্য।” (সূরা আন নাহল, ১৬:৬৪)

বিচারকার্য: “এটা নির্ধারিত সত্য যে আমরা তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি, যাতে করে আল্লাহর দেখানো সঠিক বিধান অনুসারে তুমি মানুষের মাঝে বিচার-ফয়সালা করতে পার। আর তুমি বিশ্বাসঘাতক লোকদের পক্ষে ওকালতি করোনা।” (সূরা আন নিসা ৪:১০৫)

কুরআন নাযিলের যে কারণগুলো আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন তা উপরের আয়াতগুলো থেকে জানা যায়। কারণগুলো হচ্ছে

- মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসা
- সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য করে দেয়া
- মানুষকে সতর্ক করা
- চিন্তাশীলদের চিন্তার খোরাক জোগানো
- সরল পথ দেখানোর জন্য
- আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করার জন্য

কুরআনের সাথে আমাদের আচরণ

আমরা আরবী ভাষায় কুরআন পড়ি কিন্তু অধিকাংশই এর অর্থ বুঝিনা। পৃথিবীর আর কোন বই আমরা না বুঝে পড়তে রাজি নই কিন্তু কুরআন না বুঝে পড়েও আমরা আত্মতৃপ্তি পাই, কেননা তেলাওয়াতের সওয়াবটাই আমাদের কাছে মুখ্য, আল্লাহ আমাদের কি করতে বললেন আর কি ছাড়তে বললেন তা মুখ্য না। এর ফলে আমরা শিক্ষিত হয়েও আজ ইসলামের দৃষ্টিতে চরম মুর্থ। অপরদিকে চিন্তা করে দেখি সাহাবাদের (রা) কথা, তারা অধিকাংশই ছিলেন অতি সাধারণ মানুষ, অধিকাংশই লেখাপড়া জানতেন না কিন্তু তাদের সাথে পরবর্তীদের তুলনাই চলেন। তাদের সাথে আমাদের মূলত একটাই পার্থক্য, তারা কুরআনকে নিজেদের চালিকাশক্তিতে পরিণত করেছিলেন। কুরআন ছাড়া তাদের জ্ঞান আহরণের আর কোন উৎস ছিলনা। আরবে তখন কোন মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেনি যা মানুষের জ্ঞান অর্জনে সহায়ক হবে। শুধু কুরআন জানা অল্পসংখ্যক সাহাবারাই তো অর্ধপৃথিবীকে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে এসেছিলেন, যে কাজ আজ আমরা ভূরি ভূরি মুসলিমও করতে সক্ষম নই। কুরআন আমরা সযত্নে তুলে রাখি, শুধুমাত্র সে কুরআন খোলা হয় কারও মৃত্যুর সময় বা রমযান মাসে খতম করার অভিপ্রায়ে, বাকিটা সময় এর উপর ধুলো জমতে থাকে। আমরা যদি এই দুনিয়ায় ও আখেরাতে সফলকাম হতে চাই তবে কুরআন ও সুন্নাহকে (যা কিনা কুরআনেরই ব্যাখ্যা) আঁকড়ে ধরা ছাড়া আর কোন পথ নেই।

কেউ কেউ বলে থাকেন নিজে নিজে কুরআন পড়া যাবেনা, কুরআন পড়তে হবে শিক্ষকের কাছে। তারা আরো বলেন সাধারণ মানুষের জন্য কুরআন পড়ার থেকে দরুদ পড়া উত্তম। এর কারণ হিসেবে তারা বলেন দরুদ পড়লে সওয়াব আছে কিন্তু গুনাহ হবার সম্ভাবনা নেই কিন্তু একজন গুনাহগার যখন কুরআন পড়ে তখন তার গুনাহ আরো বেড়ে যায় কেননা সে কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। এই যুক্তিতে কুরআন পাঠ ছেড়ে দেয়া একেবারেই মানায় না কারণ কুরআন পড়ার কারণে গুনাহ হয়নি, কুরআন না পড়লেও তার (অবাধ্যতার) গুনাহ একই থাকছে। এ প্রসঙ্গে খুররম মুরাদের বক্তব্য হচ্ছে, “একটু চিন্তা করে দেখুন, তাঁরা কি একজন আরবকে কুরআনের শাব্দিক অর্থ বুঝতে নিষেধ করতে পারেন? তাহলে কেন একজন অনারবের অনুবাদ পড়া উচিত নয়? তা ছাড়াও তাঁরা কি কাউকে অন্য কোন বিষয় পড়ে তা থেকে অর্থ অনুধাবন বা সম্প্রদান করা থেকে বিরত রাখতে পারেন? তাহলে কেন কুরআন অধ্যয়ন করে অর্থ বুঝার প্রয়াস চালাতে নিষেধ করা হবে? তাছাড়া মুসলিম ও কাফির নির্বিশেষে কুরআনের যে প্রথম অবতীর্ণ আয়াত সে সম্পর্কেই বা কি বলা যায়? তারা ছিল নিরক্ষর এবং বেদুইন, যাদের না ছিল জ্ঞানার্জনের কোন উপায়-উপকরণ। তথাপি অনেক কাফির কারও সাহায্য ছাড়াই শুধুমাত্র শুনে এবং এমনকি প্রথমবার শুনেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন।”

শুধুমাত্র কুরআন শুনে মুশরিক উমর (রা) ঈমানদারে পরিণত হয়েছেন, খ্রীস্টান সম্রাট নাজ্জাশী অশ্রুপাত করেছেন এবং একদল জ্বীন মুহাম্মদ (সা) কে নবী বলে মেনে নিয়েছে। তাই কুরআন আমরা আলেমগণের তত্ত্বাবধানে থেকে শিখব, সে সুযোগ না হলে তাদের ব্যাখ্যা পড়ব কিন্তু কোন অবস্থায় কুরআন ছেড়ে দেবনা।

কুরআনকে বুঝতে হলে

আমরা যারা কুরআনকে পড়তে আগ্রহী তাদের শুধু কুরআনকে পড়লেই চলবেনা, এর অর্থও হৃদয়ংগম করতে হবে। আমাদের বর্তমান ব্যক্তিগত জীবন, সমাজ ও বিশ্বব্যবস্থার (ডিংসফ ডংফবৎ) আলোকে কুরআনের বাণী কি শিক্ষা দেয় তা বুঝতে হবে। আমাদের মাঝে কুরআন তেলাওয়াত বহু লোকেই করে, কিন্তু অধিকাংশই বুঝে পড়েন না। আরো আশঙ্কাজনক ব্যাপার হচ্ছে এদের অনেকেই না বুঝে পড়েই তৃপ্ত। কিন্তু আল্লাহ যখন কুরআন পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন তখন কি না বুঝে পড়তে বলেছেন? কুরআন হাদীস থেকে না বুঝে পড়ার কোন নির্দেশ এসেছে? মানুষ যদি না বুঝেই পড়ে তবে কুরআনে এত জ্ঞানগর্ভ ভাষণের কিইবা দরকার ছিল? সারা কুরআন তো আলিফ, লাম, মীম এর মত হরফ (যার অর্থ আল্লাহই ভাল জানেন) দিয়ে ভরা থাকতে পারত। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি কুরআন নাযিলের একটা কারণ হচ্ছে আল্লাহ চান আমরা তাঁর বাণীকে বুঝার চেষ্টা করি, তাঁর আয়াত নিয়ে চিন্তা করি। এখন এই বুঝার পথে অগ্রসর হবার আগে কয়েকটা ব্যাপার জানা থাকলে আমরা কুরআন পড়ে অনেক বেশি লাভবান হতে পারব। নচেৎ দেখা যাবে অর্থ বুঝে কুরআন পড়েও এর মূল বক্তব্য আমাদের কাছে অস্পষ্ট রয়ে যাবে অথবা মাঝপথেই আমরা উদ্যম হারিয়ে ফেলব।

কুরআন প্রাচীন কালের ইতিহাস বর্ণনাকারী কোন উপন্যাস নয়, এটি মানুষের জন্য পথনির্দেশ, এটি মানুষের চোখ খুলে দেয়। যারা কুরআনকে বুঝে পথ চলবে তারা পথ হারাবে না। এই কুরআনকে বুঝার জন্য আমাদের যেসব বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে তা হচ্ছে—

- **কুরআনের মূল লক্ষ্য:** কেউ যদি কুরআনের মূল লক্ষ্যগুলোকে সামনে না রেখে কুরআন পড়েন তবে তিনি সেই ব্যক্তির মত যিনি সবচেয়ে লেটেস্ট মডেলের কম্পিউটার কিনে শুধু গেমস্ খেলার জন্য একে ব্যবহার করেন। কোন বই পড়ে লাভবান হতে হলে একজনকে বইটির মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মাথায় রাখতে হবে। ব্যক্তির উদ্দেশ্য ভেদে পড়ার ধরনও বিভিন্ন হয়। কেউ যদি শুধু বরকত লাভের আশায় কুরআন পড়েন তবে তিনি অর্থ বুঝার তোয়াক্কা না করে দ্রুত পড়ে যান। একজন মুসলিম যদি না বুঝে কুরআন পড়েন তাহলে খুব একটা লাভ হবেনা। এভাবে কুরআন পড়লে আল্লাহর বাণী একজনের উপর প্রভাব ফেলতে পারেনা। তাই আমাদের কুরআন অধ্যয়নকে অর্থবহ করতে কুরআনের নিম্নোক্ত মূল লক্ষ্যগুলো মাথায় রাখা দরকার—

ক) কুরআন আল্লাহর একত্ববাদ (তাওহীদ) শিক্ষা দেয়: মানবমন সবসময় তার স্রষ্টাকে জানতে চায়। কুরআন মানুষকে সেই স্রষ্টা, তাঁর নির্দেশাবলী ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে জানায়। কুরআনের এই শিক্ষা থেকে মানুষ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ে ও আরো বেশি করে আল্লাহকে ভালোবাসতে শুরু করে। আল্লাহ যদি তাঁর সম্পর্কে না জানাতেন তবে মানুষের পক্ষে আন্দাজ অনুমান করে কখনই আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া সম্ভব হতনা। তাই কেউ যখন কুরআন পড়ে তখন তার বুঝা উচিত সে তার স্রষ্টা ও প্রতিপালক সম্পর্কে পড়ছে। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর এক সাহাবীকে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘তুমি কি জানো কুরআনের কোন আয়াতটি সবচেয়ে সেরা?’ সাহাবী সঠিক উত্তর দিয়েছিলেন— সেই আয়াতটি হচ্ছে আয়াতুল কুরসী।

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ
مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ
الْعَظِيمُ

“আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারেনা এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে (পৃথিবী) কিংবা পেছনে (আখিরাত) যা কিছু রয়েছে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারেনা, যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত। তাঁর কুরসি সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।” (সূরা বাকারা, ২:২৫৫)

কুরআনের সেরা আয়াতটি পুরোটাই আল্লাহর মহত্ত্বের বর্ণনা।

এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে আল্লাহ তাআলার নিজের স্বরূপ সম্পর্কে জানানোই কুরআনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সূরা ইখলাসকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে, এই সূরাও আল্লাহর বর্ণনা। এই বর্ণনাগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি ইবাদত শুধু আল্লাহরই জন্য। তাই এখন থেকে আমরা আল্লাহর গুণবাচক আয়াত পড়ার সময় স্মরণ রাখব যে এগুলো বুঝা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

খ) কুরআন সঠিক পথ দেখায়: আল্লাহর নাম, গুণাবলী জানার পর যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায় জানা। আমরা প্রতি নামাযের প্রতি রাকাতে আল্লাহর কাছে একটা মূল্যবান বস্তু চাই:

أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ① صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ②

“আমাদের সরল পথ দেখাও, সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাজিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।” (সূরা ফাতিহা, ১:৫-৭)।

আল্লাহ আমাদের এ ডাকে সাড়া দিয়ে সূরা বাকারার শুরুতেই বলেছেন,

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

“এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই, পথ প্রদর্শনকারী মুত্তাকীদের জন্য।” (সূরা বাকারা ২:২)

অর্থাৎ মুত্তাকীদের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই কুরআন দিক নির্দেশনা দেয়। রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্যাহও এই দিক নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত কেননা কুরআনেই সুন্যাহর অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। এভাবে কুরআন পড়ার মাধ্যমে আমরা জানতে পারব কিভাবে কোন পথে গেলে আল্লাহ আমাদের উপর খুশি হবেন। আল্লাহকে খুশি করতে পারলেই দুনিয়া ও আখেরাতে আমরা নিশ্চিত হতে পারি। কেয়ামত পর্যন্ত কুরআন মুসলিমদের সরল পথ দেখাবে, আমাদের তাই সরল পথের সন্ধানে কুরআনের কাছে ধর্না দিতে হবে।

গ) কুরআন ব্যক্তিসত্তাকে পরিশুদ্ধ করতে চায়: কুরআন শুধুমাত্র একটি বিধিবিধানের গ্রন্থ নয়, এটি এমন একটি গ্রন্থ যা একজন মানুষের চরিত্র গড়ে তোলে। কুরআন শুধু আমাদের সঠিক পথের জ্ঞানই (ইলম) দেয়না বরং সেই সঠিক কাজ করার জন্য ভীতি, ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধও (তাকওয়া) দেলে দেয়। কুরআনে নানাভাবে এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে; যেমন আল্লাহ মানুষের কাছে এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর স্বরূপ বর্ণনা করেছেন, পৃথিবীর আনন্দের সাথে জান্নাতের পার্থক্য দেখিয়েছেন, তিনি আরও বর্ণনা করেছেন বিচার দিবসে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের পরিণাম।

কুরআনে প্রায় প্রতিটি বিধান বর্ণনার শেষে আল্লাহর স্মরণ, অনুগতদের জন্য পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি এবং অবাধ্যদের জন্য শাস্তির প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে। এই ইলম এবং তাকওয়া একসাথে বর্ণনার অসংখ্য উদাহরণ আছে, যেমন সূরা বাকারায় ২২১-২৪২ আয়াত পর্যন্ত বারোটি ভিন্ন ধরনের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতিটি বিধানের পর পরই আল্লাহ তাঁর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে তাঁকে ভয় করার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।

আল্লাহ কেন ‘ইলমের’ সাথে ‘তাকওয়া’ জুড়ে দিলেন? এর কারণ হচ্ছে শুধু ভাল-মন্দের বা সঠিক-বেঠিকের জ্ঞানই মানুষকে সঠিক পথে রাখার জন্য যথেষ্ট নয়, এর জন্য চাই অন্তরের তাগিদ। এর বাস্তব উদাহরণ পশ্চিমা বিশ্বে দেখা যায়- পশ্চিমা জানে ধূমপান, মদ্যপান, নেশাদ্রব্য ক্ষতিকর কিন্তু তবুও তাদের কয়জন এসব থেকে দূরে থাকার প্রেরণা পায়? এজন্য কুরআন পড়ার সময় এই তাকওয়ার বাণীগুলো আমাদের হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) কুরআন ইসলামী সমাজ তৈরির কথা বলে: কুরআন মানুষকে বৃহত্তর সমাজের অংশ হিসেবে বর্ণনা করেছে, কুরআনে এসেছে সামাজিক দায়িত্ব, সামাজিক অধিকার, পারস্পারিক সমঝোতার নির্দেশ।

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنْتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَأَنْتَقُوا إِلَهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا

“হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট [তোমাদের অধিকার] চেয়ে থাক এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন।” (সূরা নিসা ৪:১)

কুরআন আল্লাহর সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনায় পরিচালিত এক অনন্য সমাজ গড়তে বলে। ধর্মবিমুখ সমাজ থেকে তা আলাদা। ইসলামী সমাজ ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজে বাধা দেবে।

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

“তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সংকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।” (সূরা আলে ইমরান, ৩:১১০)

কুরআনের সমাজ ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দেয়না, এখানের সদস্যরা একত্রে মন্দকে দূর করে ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে। এই চিন্তাধারা পশ্চিমাদের থেকে ভিন্ন। সেখানে কেউ সমাজের তোয়াক্কা না করে নিন্দনীয় কাজে লিপ্ত থাকতে পারে, সমাজ সেসব দেখেও না দেখার ভান করে।

এজন্য একজন যখন কুরআন পড়ে, তার অবশ্যই বুঝা উচিত কুরআন তাকে সমাজ তথা গোটা মানবজাতির সদস্য হিসেবে তার কর্তব্য ও অধিকার প্রদর্শন করছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কুরআন অধ্যয়ন করলে প্রতিটি মুসলিমই নিজ জাতি ও পৃথিবীর জন্য উপকারী বলে প্রতীয়মান হবে।

৬) কুরআন মুসলিমদের শত্রুদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করে: ইসলামের প্রসার একটি আদর্শগত বিপ্লবের মত যা সকল জাহিলিয়াতের শিকড় উপড়ে ফেলে। এই পরিবর্তন করতে গিয়ে বাধা আসবে। দ্রাস্ত পথে পরিচালিত বিলাসী শাসকগোষ্ঠী তাদের ক্ষমতার পরিবর্তন চাইবেনা। সাইয়েদ কুতুবের মতে ইতিহাস শিক্ষা দেয় জাহিল সমাজ শান্তি চায়না, তারা যুদ্ধের পথ বেছে নেয়। এই সংঘাতে আল্লাহ মুসলিমদের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, তিনি জানিয়েছেন কিভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে

শক্তি অর্জন করতে হয়, সংঘাতের সময় কি নীতি অবলম্বন করতে হয়। মুসলিমদের সবচেয়ে বড় শত্রু শয়তান। তার থেকে আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহ শিখিয়ে দিয়েছেন,

وَأِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“যদি শয়তানের পক্ষ থেকে আপনি কিছু কুমন্ত্রণা অনুভব করেন, তবে আল্লাহর শরণাপন্ন হোন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।” (সূরা ফুসসিলাত, ৪১:৩৬)

মুসলিমদের আরো শত্রু আছে, তাদের আল্লাহ পরিষ্কার ভাবে চিনিয়ে দিয়েছেন। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন অবিশ্বাসীরা, মুশরিক, ইহুদি ও খ্রীস্টানরা কিভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। মুসলিমদের আভ্যন্তরীণ শত্রু মুনাফিকদের ব্যাপারেও আল্লাহ দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন (যেমন সূরা মুনাফিকুন)। আল্লাহ আরও এক শত্রুর কথা জানিয়েছেন, যাকে তিনি না চিনিয়ে দিলে মানুষ বুঝতে পারতোনা – সে হচ্ছে নিজ নফস।

وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“যারা নিজ নফসের লালসা থেকে মুক্ত, তারা ই সফলকাম।” (সূরা আল হাশর, ৫৯:৯)

মুসলিমদের কুরআন পাঠ করার সময় তাই খেয়াল রাখতে হবে আল্লাহ তাকে সত্যিকারের শত্রুদের ব্যাপারে সতর্ক করছেন, এই শত্রুরা তাকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করছে। শত্রুদের আচরণ ও কিভাবে আত্মরক্ষা করা যায় সে সম্পর্কে কুরআনের আয়াতগুলো মনে গেঁথে নেয়া প্রয়োজন।

উপরে আলোচিত কুরআনের লক্ষ্যগুলো মূলত একটি লক্ষ্য থেকে উৎসারিত, আর তা হচ্ছে এক আল্লাহকে বিশ্বাস (তাওহীদ)। এক আল্লাহকে শুধু স্রষ্টা হিসেবে মানাই যথেষ্ট না, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নেয়াও তাওহীদের অংশ।

- **কুরআনের কাহিনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ:** কুরআনে বহুস্থানে অতীতের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এই কাহিনীগুলোর ভিতর খুবই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও উপদেশ বিদ্যমান। এই কাহিনীগুলো একবারে বর্ণিত হয়নি (সূরা ইউসুফ ব্যতীত), তাই একথা সুস্পষ্ট যে ইতিহাস বর্ণনা আল্লাহর উদ্দেশ্য নয় বরং এই কাহিনীগুলোর মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের দিক নির্দেশনা দিতে চান। সূরা ইউসুফের সমাপ্তিতে আল্লাহ বলেছেন,

لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَلْبَابِ

“তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়।” (সূরা ইউসুফ, ১২:১১১)

কুরআনের কাহিনীগুলো অপ্রাসঙ্গিক ডালপালা বিবর্জিত। কিছু লোককে তাই যেসব তথ্য বর্ণনা করা হয়নি তার পিছনে ছুটতে দেখা যায় (যেমন আসহাবে কাহাফের কুকুরের নাম ও গায়ের রঙ কি ছিল)। আমাদের মনে রাখা উচিত কুরআনে যা বর্ণিত হয়েছে তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

কুরআনের কাহিনীগুলোর থেকে আমরা যেসব শিক্ষা পাই তা হচ্ছে – কিভাবে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতে হয় (সধহহবৎ) এবং কোন বিষয়গুলোকে শুরুতেই দৃষ্টিগোচর করা উচিত। কাহিনীগুলো থেকে এটা পরিষ্কার দেখা যায় সকল নবী রাসুলদের মূল কথা একটাই ছিল এবং তা হল – তাওহীদ। কুরআনের ভাষ্যমতে

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنَا فَاعْبُدُونِ

“আপনার পূর্বে আমি যে রসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর।” (সূরা আমবিয়া, ২১:২৫)

এই সকল কাহিনী থেকে আরও জানা যায় মানবজাতির প্রকৃত ধর্ম চিরকাল একই ছিল। ধর্মের মধ্যে বিবর্তন (বাড়মঃরড়হ) ঘটেছে এমনটি নয় (যেমনটি সমাজবিজ্ঞানীরা ধারণা করে থাকে), মানুষ শুরুতে বহুঈশ্বরবাদ থেকে সময়ের পরিবর্তনের সাথে একেশ্বরবাদে উপস্থিত হয়নি। বরং পৃথিবীর শুরু থেকেই তাওহীদের চর্চা চালু ছিল। মুসলিমদের আগেও বহু জাতি বিগত শতাব্দীগুলোতে আল্লাহর পথে টিকে থাকার সংগ্রাম করেছে।

তৃতীয়ত, এই কাহিনীগুলো ছিল রাসুলুল্লাহর (সা) জন্য হতাশার মাঝে আশার টুকরো মেঘ। নবীদের কাহিনীতে আমরা দেখতে পাই তাদের জাতি কিভাবে তাদের প্রত্যাখ্যান করেছিল। কিন্তু এর মাঝেও নবী রাসুলরা ধৈর্য ধরে এসব কষ্টের সময় অতিক্রম করেছেন। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ নবী রাসুলদের সাহায্য করেছেন। এভাবে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে:

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنْشِئُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ
الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

“আর আমি রাসূলগণের সব বৃত্তান্তই তোমাকে বলছি, যা দিয়ে তোমার অন্তর মজবুত করছি। আর এভাবে তোমার নিকট মহাসত্য এবং ঈমানদারদের জন্য নসীহত ও স্মরণীয় বিষয়বস্তু এসেছে।” (সূরা হুদ, ১১:১২০)

চতুর্থত, কুরআনের কাহিনী থেকে দেখা যায় আল্লাহ তাঁর একনিষ্ঠ বান্দাদের কতোইনা দয়া করেছেন। তাই একজন পাঠকের বুঝা উচিত সে যদি আল্লাহর রাস্তায় কাজ করে তবে আরশের অধিপতি তার কর্মকে ব্যর্থ করে দেবেননা। এটা আল্লাহরই এক প্রতিশ্রুতি:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

“হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদমকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করবেন।” (সূরা মুহাম্মদ, ৪৭:৭)

পঞ্চমত, আল্লাহ সব কিছুই উপর ক্ষমতাবান। কুরআনের কাহিনীগুলোতে আল্লাহর শক্তি কত বেশি তা আন্দাজ করা যায়। আল্লাহ ইচ্ছা করলেই মুজিয়া ঘটাতে পারেন। যা কিছু আমাদের কাছে অলৌকিক, ব্যাখ্যার অতীত, তা আল্লাহর কাছে সামান্য ব্যাপার। মুসা (আ), ঈসা (আ) এর মুজিয়া পড়ে বিস্মিত হওয়ার পাশাপাশি এটাও বুঝতে হবে আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন ক্ষমতাই ছিলনা।

ষষ্ঠত, বিভিন্ন নবী রাসূল তাদের জাতিকে বিভিন্ন পদস্থলন থেকে বাচাতে চেষ্টা করেছেন। যেমন শূয়াইব (আ) এর জাতি ব্যবসায় দুর্নীতির আশ্রয় নিত, লুত (আ) এর জাতি সমকামিতা শুরু করেছিল। তাদের কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি সমাজ থেকে এসব মন্দ দূর করার ক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয়।

সপ্তমত, এই কাহিনীগুলোর নির্ভুলতা যাচাই করার পর বুঝা যায় মুহাম্মদ (সা) আসলেই আল্লাহর নবী, কেননা তাঁর মত নিরক্ষর, শিক্ষক বঞ্চিত একজন মানুষের কাছ থেকে অতীতের ইতিহাসের বর্ণনা অলৌকিক ব্যাপার। তিনি এমন কাহিনীও বর্ণনা করেছেন যা ইহুদি পণ্ডিতরা ছাড়া কেউ অবহিত ছিলনা। আল্লাহও তাই নুহ (আ) এর কাহিনী বর্ণনা করার পর নবীকে (সা) বলছেন,

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيبَةَ لِلْمُتَّقِينَ

“এটি গায়েবের খবর, আমি আপনার প্রতি অহী প্রেরণ করছি। ইতিপূর্বে এটা আপনার এবং আপনার জাতির জানা ছিলনা। আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। যারা ভয় করে চলে, নিঃসন্দেহে তাদের পরিণাম ভাল।” (সূরা হুদ, ১১:৪৯)

কুরআনের কাহিনী থেকে আরও জানা যায় ইহুদি, খ্রীষ্টানরা তাদের ধর্মগ্রন্থে কি পরিমাণ বিকৃতি সাধন করেছে। তারা নবীদের চরিত্র কালিমালিগু করে ছেড়েছে, তাওহীদের বাণীকে অস্পষ্ট করেছে। কুরআন নবীদের মহান চরিত্র, তাদের অধ্যবসায়ের স্বীকৃতি দেয়; নবীদের জন্য আমাদের মনে ভক্তি জাগায়।

- **কতিপয় শিষ্টাচার:** মুসলিমদের কুরআন বুঝতে হলে এর জন্য সেরা সময়, স্থান ও পরিবেশ বেছে নিতে হবে। এ কারণে ইসলামী চিন্তাবিদরা কিছু শিষ্টাচার পালনের উপদেশ দিয়েছেন।

এসব পদ্ধতির অনুসরণ পাঠককে মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে প্রস্তুত করবে। এসব পদ্ধতির কিছু কিছু কুরআন হাদীস সমর্থিত এবং কিছু সাহাবাদের (রা) থেকে জানা যায়, বাকিগুলো আলেমগণ তাদের অভিজ্ঞতার থেকে বলে থাকেন। এসব কিছু করার মূল লক্ষ্য হচ্ছে কুরআনকে হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করা। আল্লাহ কুরআনে বলছেন:

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

“এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার অনুধাবন করার মত অন্তর রয়েছে অথবা যে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে।” (সূরা ক্বাফ, ৫০:৩৭)

ইবনুল কাইয়্যিম এই আয়াত থেকে কুরআন শ্রবণ করার শর্তাবলী ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমত, শ্রোতাকে ‘অন্তর’ দিয়ে শুনতে হবে। যদি হৃদয় বা অন্তর প্রস্তুত না থাকে তবে ঠোঁট নাড়লেও লাভ নেই। দ্বিতীয়ত, শ্রোতাকে মনোযোগ দিয়ে কান পেতে শুনতে হবে। শুনতে শুনতে বুঝার চেষ্টা করতে হবে। এখানে সংক্ষেপে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিষ্টাচার আলোচিত হল:

ক) কুরআন পাঠের সঠিক সময়: এমন একটা সময় বেছে নেয়া উচিত যখন পরিপূর্ণ মনযোগ দেয়া সম্ভব। কুরআন ও হাদীস থেকে যে দুটি সময়ের কথা জানা যায় তা হচ্ছে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ ও ফজরের সময়। কুরআনের পাঠের সময়সীমা কি হবে বা কত সময় পর পর কুরআন পড়া উচিত তা নির্ধারণ করা কঠিন। সুন্নাহ ও সাহাবাদের রীতি থেকে জানা যায় তারা একটি দিনও কুরআনের কিছু অংশ পাঠ না করে যেতে দিতেননা। আল নববী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে কোন কোন সাহাবা দুইমাসে, কেউ একমাসে, কেউ এক সপ্তাহে কুরআন খতম দিতেন। এ থেকে বুঝা যায় কুরআন পাঠের অভ্যাস ব্যক্তিগত সামর্থের উপর নির্ভর করে। তবে খুব দ্রুত কুরআন খতম করা উচিত নয়, মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত অর্থ অনুধাবন করা। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: “যে তিনদিনের কমে কুরআন পড়ে (খতম দেয়) সে কুরআন বুঝবে না।” (আবু দাউদ, তিরমিযি, বায়হাকি কর্তৃক সংগৃহীত)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রা) বলেছিলেন: “এমন ভাবে (কুরআন) পড়োনা যেন খেজুর ছুড়ে ছুড়ে ফেলছ অথবা দ্রুত ছড়া আবৃত্তি করছো। বরং প্রতিটি চমৎকার বাণীতে থাম এবং হৃদয়কে আন্দোলিত হতে দাও। তোমাদের কারও শুধু সূরাটা শেষ করার কথা চিন্তা করা উচিত নয়।”

খ) পাঠের স্থান: কুরআন পাঠের স্থান হওয়া উচিত শান্ত নিরিবিলি। মসজিদ কুরআন পাঠের জন্য খুবই উপযোগী।

গ) দেহভিজ্জি: আলেমদের মতে কুরআন পড়ার সময় কেবলামুখী হয়ে নামাযে বসার ভিজ্জিতে বসা উচিত। এতে পাঠকের খেয়াল থাকবে সে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে। তবে প্রয়োজনে শুয়ে বা হেলান দিয়েও কুরআন পড়া যায়, এ ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। কেউ যদি ভাবে বসে না থাকলে কুরআন পড়া যাবেনা, তা ভুল। কুরআনকে সম্মান দিয়ে যেভাবে বেশি মনোযোগ আসে সেভাবে তা পড়া উচিত।

ঘ) নিয়ত: রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: “নিয়ত বিচার করে সওয়াব দেয়া হয়।” (বুখারী ও মুসলিম)

কুরআন পাঠ থেকে আমরা উপকৃত হতে চাইলে আমাদের নিয়তের শুদ্ধতা থাকতে হবে। প্রতিটি ইবাদতের পেছনে নিয়ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের নিয়ত যদি হয় সুন্দর তেলাওয়াত করে লোকের প্রশংসা নেয়া বা মুখস্থ করে বাহবা কুড়ানো তা হলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব। কুরআন পাঠের নিয়ত হতে হবে আলাহকে খুশি করা। তাহলে আলাহ আমাদের সরল পথ দেখাবেন। খ্রীস্টান মিশনারি ও প্রাচ্যবিদরা (orientalist) অসৎ নিয়তে কুরআন পড়েন তাই তারা কুরআন থেকে হেদায়েত পাননা।

ঙ) আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা: পাঠককে কুরআনের থেকে উপকৃত হতে হলে তাকে আল্লাহর দিকে ফিরতে হবে। কুরআন বুঝার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে। কুরআন পাঠের শুরুতে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশও দেয়া হয়েছে।

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

“আপনি যখন কুরআন পাঠ করেন, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন।” (সূরা নাহল, ১৬:৯৮)

কুরআন পাঠের আগে শয়তানের প্রতিরক্ষাস্বরূপ এই দোআ আমাদের অন্তরকে পবিত্র করে তোলে। এই দোআ পড়া না হলে শয়তান আগে থেকে আমাদের মনে বাসা বাঁধার সুযোগ পায়। শয়তান কুরআন পাঠকারীকে বিরক্ত করতে চেষ্টা করে, যাতে সে কুরআন মনোযোগ দিয়ে পড়তে না পারে। নবীদের সময়ও শয়তান তাদের তেলাওয়াতের মধ্যে বাড়তি কথা জুড়ে দিত। নবীদের ক্ষেত্রে যা হয়েছে তা আমাদের ক্ষেত্রে হওয়া খুবই স্বাভাবিক, এজন্য তেলাওয়াতে মাঝে মাঝে ভুল হবে। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার (রঃ) মতে “নামাযী ব্যক্তিকে শয়তান বেনামাযীর থেকে বেশি কুমন্ত্রণা দেয়। দ্বীন শিক্ষার্থীরা শয়তানের অনেক বড় শত্রু, তাই তাদের উপর শয়তানের আক্রমণও সাংঘাতিক হয়ে থাকে। এই পরিস্থিতিতে কুরআন পাঠে লাভবান হতে হলে একজনের আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা খুবই জরুরি।”

- **নিরপেক্ষ মন:** কুরআন পাঠের সময় আমাদের ‘খোলা মন’ নিয়ে বসতে হবে। মওদুদী (রঃ) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, “কোন ব্যক্তি কুরআনের ওপর ঈমান রাখুন আর নাই রাখুন তিনি যদি এই কিতাবকে বুঝতে চান তাহলে সর্বপ্রথম তাঁকে নিজের মন-মস্তিষ্ককে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত চিন্তাধারা ও মতবাদ এবং অনুকূল-প্রতিকূল উদ্দেশ্য ও স্বার্থচিন্তা থেকে যথাসম্ভব মুক্ত করতে হবে। এ কিতাবটি বুঝার ও হৃদয়ংগম করার নির্ভেজাল ও আন্তরিক উদ্দেশ্য নিয়ে এর অধ্যয়ন শুরু করতে হবে। যারা মনের মধ্যে বিশেষ ধরনের চিন্তাধারা পুষে রেখে এ কিতাবটি পড়েন তারা এর বিভিন্ন ছত্রের মাঝখানে নিজেদের চিন্তাধারাই পড়ে যেতে থাকেন। আসল কুরআনের সামান্য বাতাসটুকুও তাদের গায়ে লাগে না। আর বিশেষ করে কুরআন তো এই ধরনের পাঠকের জন্য তার অন্তর্নিহিত সত্য ও গভীর তাৎপর্যময় অর্থের দুয়ার কখনই উন্মুক্ত করে না।” কেউ যদি আগে থেকেই উচিত অনুচিতের ব্যপারে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কুরআন পড়ে তবে সে নিজের কথাগুলোই পড়ে যাবে,

কুরআন তাকে দিক নির্দেশনা দেবেনা। কুরআনের একটি বলিষ্ঠ বক্তব্য আছে, কুরআনকে তার বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দিতে হবে। অনেকে কুরআন থেকে তার যেকোন মতের সপক্ষে দলিল খুঁজে বের করেন, অনেকটা জোর করে হলেও প্রমাণ করতে চান নিজের জ্ঞানের (?) যথার্থতা। ইসলামের ইতিহাসে এরূপ পক্ষপাতিত্বমূলক ভুল ব্যাখ্যার কারণে বিভিন্ন উপদলের সৃষ্টি হয়েছে।

একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে। কেউ যদি প্রমাণ করতে চান খ্রীস্টানদেরকে মিত্র হিসেবে গ্রহণ করা জায়েজ তবে তিনি কুরআনের অন্যান্য আয়াতকে অগ্রাহ্য করে যে আয়াতটি বলবেন তা হল:

﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةَ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِيْ ذَٰلِكَ بِأَنَّ
مِنْهُمْ قَسِيْسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

“আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলিমদের অধিক শত্রু ইহুদী ও মুশরিকদের পাবেন এবং আপনি সবার চাইতে মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্বে অধিক নিকটবর্তী তাদেরকে পাবেন, যারা নিজেদের খ্রীস্টান বলে। এর কারণ এই যে, খ্রীস্টানদের মধ্যে আলেম দরবেশ রয়েছে এবং তারা অহংকার করেন।” (সূরা আল মাদেদা, ৫:৮২)

ঐ ব্যক্তি কুরআনের যে যে আয়াতকে অগ্রাহ্য করছে তার উদাহরণ হল

وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۚ

“ইহুদি ও খ্রীস্টানরা কখনই আপনার উপর সন্তুষ্ট হবেনা, যতক্ষণ না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন।” (সূরা বাকারা ৩:১২০)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুসলিমদের বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে বন্ধু বানিও না।” (সূরা নিসা ৪:১৪৪)

অর্থাৎ নিরপেক্ষ মন না থাকলে কুরআন থেকে খুব সহজেই ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া যায়।

- **তাদাব্বুর:** কুরআনের এক একটি আয়াত মহামূল্যবান, জ্ঞান পিপাসুর কাছে এক একটি শব্দ হীরার থেকেও দামী। কুরআন ছাড়া পৃথিবীর আর কোন গ্রন্থই ১০০% সঠিক তথ্য দেয়না। আলেমরা কখনও একটি মাত্র আয়াত থেকেও অসংখ্য ফিক্হ, উপদেশ বের করেছেন। কিন্তু আমরা বর্তমানে কুরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তা করা ছেড়েই দিয়েছি। কুরআনের কল্যাণ চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের (উলুল আলবাব) জন্য, চিন্তাশূন্যরা এর থেকে পরিপূর্ণ উপকার পায়না। আলাহ কুরআনে বলেছেন:

كَتَبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا
الْأَلْبَابِ

“এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ লক্ষ্য করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে।” (সূরা ছোয়াদ, ৩৮:২৯)

কুরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তা না করতে শিখলে আমরা এর মূল বিষয়বস্তু, এক পয়েন্টের সাথে অন্য পয়েন্টের ঐক্য, আমাদের নিজেদের জীবনের আলোকে এর অবস্থান ধরতে সক্ষম হব না।

কেউ যদি কুরআনকে শুধু তেলাওয়াতই করে, তা নিয়ে ভাবতে না শিখে তবে সে কুরআনে বর্ণিত কাফেরদের মত:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

“তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ”? (সূরা মুহাম্মদ ৪৭:২৪)

আলী (রা) বলেছেন, “না বুঝে পড়ায় কোন মঞ্জুল নেই, অনুধাবন না করে জ্ঞান অর্জনেও লাভ নেই, একগ্রতা ছাড়া ইবাদতে কোন ফায়দা নেই।” এজন্য কুরআন মনোযোগ দিয়ে বুঝে কম পড়া, না বুঝে বেশি পড়ার থেকে উত্তম।

- **শাস্বত বাণী :** কুরআন পাঠ করার সময় অনেকের মনে হতে পারে এর আয়াতগুলো সুদূর অতীতের কথা বলছে, এই আয়াতগুলো একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে, নির্দিষ্ট কিছু লোককে লক্ষ্য করে নাজিল হয়েছে। এরকম ভাবলে কুরআনের অধিকাংশ আয়াতই এ যুগে অচল হয়ে পড়ে। কিন্তু কেয়ামত পর্যন্ত এই কুরআন মানবজাতির জন্য হেদায়েত। এতে এমন শিক্ষা দেয়া হয়েছে যা স্থান, কালের সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ নয়, এর শিক্ষা সব স্থানে সবসময় প্রযোজ্য। তাই বলে আমরা বলছি না আয়াতের শানে নুজুলের (আয়াত নাজিলের উপলক্ষ্য) দরকার নেই। শানে নুজুল আমাদের আয়াত গুলো ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করে। মুফাসসিরগণ (কুরআন ব্যাখ্যাকারী) এই কথাটি জানেন বলেই তারা নিজেদের সময়কালে এবং নিজ এলাকার জন্য কুরআন থেকে দিক নির্দেশনা লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন। পাঠককে তাই কুরআন অধ্যয়নের সময় তার চারপাশের পরিস্থিতির সাথে আয়াতগুলো মিলিয়ে দেখতে হবে। তখন পাঠক আবিষ্কার করবেন হাজার হাজার বছর আগে সমাজে যে ধরনের মানুষ বিদ্যমান ছিল, তারা আজও নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান। যেমন আল্লাহ বলছেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ
وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ
هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

“মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা দ্বন্দ্ব জড়িত হয়ে আল্লাহর এবাদত করে। যদি সে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তবে এবাদতের উপর কান্নাম থাকে এবং যদি কোন পরীক্ষায় পড়ে, তবে পূর্বাভাসে ফিরে যায়। সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।” (সূরা আল হাজ্জ, ২২:১১)

এই আয়াতের তাফসীরে আত-তাবারী লিখেছেন, এই আয়াত মদীনার কিছু সুবিধাবাদী বেদুইন সম্পর্কে নাজিল হয়। একজন পাঠককে এটুকু জানলেই হবেনা, তাঁকে বর্তমান পরিস্থিতি চিন্তা করতে হবে। এরকম মানুষ কি তাঁর চারপাশে নেই? কেউ যদি কুরআনে বর্ণিত আচরণের সাথে নিজের মিল খুঁজে পায় তবে আয়াতটি আসলে তার কথাই বলছে! এভাবে আমরা যদি আল্লাহর বাণীকে স্থান কালের গন্ডি থেকে বের করে আনতে পারি তবেই কুরআনের শিক্ষা থেকে উপকৃত হব।

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ বলছেন,

الَّذِينَ قَالُوا لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ
فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, “তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ সজ্জাম; তাদের ভয় কর।” তখন তাদের বিশ্বাস আরো দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে, ‘আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কর্মসম্পাদনকারী!’” (সূরা আলে ইমরান, ৩:১৭৩)

কোন তাফসীর দেখা ছাড়াই যে কেউ বুঝতে পারবে এই আয়াত কোন বিশেষ ঘটনায় নাজিল হয়েছিল। কিন্তু এর ভিতর যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা খুবই গুরুত্ববহ। বর্তমানে মুসলিমরা দুর্বল আর ইসলামের শত্রুরা আর্থিক আর সামরিক শক্তিতে বলীয়ান। এই আয়াতে কি আল্লাহ এটা পরীক্ষার করে দেননি যে সত্যিকার ঈমানদাররা জানে ইসলামের শত্রুরা তাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হবে?

[এই আয়াত নাযিল হয়েছিল উহুদের যুদ্ধের পরবর্তী হামরা আল আসাদে অভিযানের ঘটনায় [ইবনে কাসীর], কিন্তু আজকে আমরা এই একই আয়াত প্রয়োগ করতে পারি মুসলিমদের প্রতি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইসরায়েল, ভারত, রাশিয়া প্রভৃতি তথাকথিত শক্তিদর জাতি এবং তাদের তাঁবেদারদের হুমকির ক্ষেত্রে।] এমনটা হলে তারা বুঝবে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং এই উপলব্ধি তার ঈমানকে আরো মজবুত করবে। ঈমানদাররা শত্রুদের ভয় করে না কারণ আল্লাহ তাদের সাথে আছেন।

এভাবে কুরআনকে আমাদের পারিপার্শ্বিকের সাথে মিলাতে পারলে দেখব কুরআন আমাদের চিন্তাধারাকে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে।

- **কুরআনের ছায়াতলে জীবন:** সাইয়েদ কুতুব তাঁর সুদীর্ঘ তাফসীর ফি যিলালিল কুরআনে বলেছেন, যতক্ষণ না একজন মুসলিম কুরআনের শিক্ষাগুলো বাস্তবায়ন করা শুরু করবে এবং কুরআনের ছায়াতলে জীবনযাপন আরম্ভ করবে ততক্ষণ সে কুরআনের প্রকৃত মাধুর্য ও নির্দেশনা পাবে না। যারা শুধু বসে বসে কুরআনের সাহিত্যিক গুণাবলী নিয়ে আলোচনা করে, তারা প্রকৃতপক্ষে বসেই থাকে। কুরআনকে জীবনে প্রয়োগ করতে না পারলে এর বাণীর গভীরতা নাগালের বাইরেই থেকে যাবে। একই কথা মওদুদী তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকায় এভাবে লিখেছেন, “.. কুরআন বুঝার এই সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যে কাজ করার বিধান ও নির্দেশ নিয়ে কুরআন এসেছে কার্যত ও বাস্তবে তা না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তি কুরআনের প্রাণসত্তার সাথে পুরোপুরি পরিচিত হতে পারে না। এটা নিছক কোন মতবাদ ও চিন্তাধারার বই নয়। কাজেই আরাম কেদারায় বসে বসে এই বইটি পড়লে এর সব কথা বুঝতে পারার কথা নয়। দুনিয়ায় প্রচলিত ধর্ম-চিন্তা অনুযায়ী এটি নিছক একটি ধর্মগ্রন্থও নয়। .. এটি একটি দাওয়াত ও আন্দোলনের কিতাব। সে এসেই এই নীরব প্রকৃতির সৎ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিকে নির্জন ও নিঃসংগ জীবন ক্ষেত্র থেকে বের করে এনে আল্লাহ বিরোধী দুনিয়ার মোকাবিলায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তাঁর কঠোর যুগিয়েছে বাতিলের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের ধ্বনি। যুগের কুফরী, ফাসেকী ও ভ্রষ্টতার পতাকাবাহীদের বিরুদ্ধে তাঁকে প্রচণ্ড সংঘাতে লিপ্ত করেছে। সচরাচর সম্পন্ন সত্যনিষ্ঠ লোকদের প্রতিটি গৃহাভ্যন্তর থেকে খুঁজে বের করে এনে সত্যের আহ্বায়কের পতাকাতলে সমবেত করেছে। .. এক ব্যক্তির আহ্বানের মাধ্যমে নিজের কাজ শুরু করে খিলাফতে ইলাহীয়ার প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত পূর্ণ তেইশ বছর ধরে এই কিতাবটি এই বিরাট ও মহান ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে। হক ও বাতিলের এই সুদীর্ঘ ও প্রাণান্তকর সংঘর্ষকালে প্রতিটি মনযিল ও প্রতিটি পর্যায়েই সে একদিকে ভাঙার পদ্ধতি শিখিয়েছে এবং অন্যদিকে পেশ করেছে গড়ার নকশা। এখন বলুন, যদি আপনি ইসলাম ও জাহিলিয়াত এবং দীন ও কুফরীর সংগ্রামে অংশগ্রহণই না করেন, যদি এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মনযিল অতিক্রম করার সুযোগই আপনার ভাগ্যে না ঘটে, তাহলে নিছক কুরআনের শব্দগুলো পাঠ করলে তার সমুদয় তত্ত্ব আপনার কেমন করে উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে? কুরআনকে পুরোপুরি অনুধাবন করা তখনই সম্ভব হবে যখন আপনি নিজেই কুরআনের দাওয়াত নিয়ে উঠবেন, মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করার কাজ শুরু করবেন এবং এই কিতাব যেভাবে পথ দেখায় সেভাবেই পদক্ষেপ নিতে থাকবেন।”

কুরআন পড়া সহজ, কিন্তু কুরআনের দাওয়াত দেয়া, কুরআন প্রতিষ্ঠা করা তত সহজ নয়। কুরআন ইসলামের প্রচার, অন্যায়ের প্রতিবাদ, আল্লাহর শাসন কায়েম করতে বলে। এসব সংগ্রামী দায়িত্ব পালন করতে শুরু করলে আমাদের চোখ খুলে যাবে। মুনাফিক, কাফির, মুশরিকদের ষড়যন্ত্র তখন দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কুরআনের বাণী যে কালোত্তীর্ণ তা আমরা হৃদয় দিয়ে অনুভব করব। আল্লাহ কুরআনেও তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়িত করে দেখানোর জন্য বলেছেন:

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“আর আমাদের অবতীর্ণ এই কিতাব খুব মঙ্গলময়। তাই তোমরা এটিকে অনুসরণ কর, মেনে চল এবং (এতে প্রদত্ত) নির্দেশ অমান্য করাকে ভয় কর। আশা করা যায় এভাবেই তোমরা অনুকম্পা লাভ করতে সক্ষম হবে।” (সূরা আল আনআম, ৬:১৫৫)

যারা মানবেনা তাদের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٨﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

“যারা অবিশ্বাস করছে, তাদের ধ্বংস নিশ্চিত। আর আল্লাহ তাদের যাবতীয় কর্মকান্ড শ্রান্ত পথে পরিচালিত করে দিয়েছেন। এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তারা তা (অনুসরণ করতে) পছন্দ করেনা। ফলে তিনি তাদের সমস্ত কর্ম ব্যর্থ করে দেবেন।” (সূরা মুহাম্মদ, ৪৭:৮-৯)

- সাহাবীরা কিভাবে কুরআন শিখেছেন: সাহাবীরা এই উম্মতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দল। তাদের সাথে আমাদের মর্যাদার পার্থক্যের একমাত্র কারণ কুরআন। তাদের কুরআন পাঠের সাথে আমাদের মিল খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রা) বলেছেন, “যখন আমাদের কেউ দশটি আয়াত শিখত, তখন সে তার অর্থ জানা ও তার উপর আমল করা ছাড়া সামনে অগ্রসর হতনা।”

আবদুল্লাহ ইবনে উমারের (রা) মতে ঈমানের চিহ্ন হচ্ছে কুরআন বুঝা। “আমরা দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেছি.... এমন এক সময় এসেছে যখন আমি দেখি একজন লোককে সমস্ত কুরআন দেয়া হয়েছে তার ঈমান আনার আগেই, সে সূরা ফাতিহা থেকে কুরআনের শেষ পর্যন্ত সবগুলো পাতাই পাঠ করে অথচ সে জানে না কুরআনের নির্দেশ, এর সতর্কবাণী, ঐসব স্থানও সে চেনে না যেখানে তাকে বিনয়ী হতে হবে। সে এটা এমন ভাবে ফেলে দেয় যেমন করে পলায়নকালে কেউ কোন কিছুকে দ্রুত ফেলে চলে যায়, সেভাবে।”

আল্লাহ কুরআনে বলছেন:

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ

“আমি যাদের গ্রন্থ দান করেছি, তারা তা যথাযথভাবে পাঠ (হাক্কা তেলাওয়াত) করে।” (সূরা বাকারা ২:১২১)

“যথাযথভাবে পাঠ” এর ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রা) বলেন, “যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ, হাক্কা তেলাওয়াত অর্থ যা হালাল তা হালাল মনে করা, যা হারাম তা হারাম গণ্য করা, যেভাবে আল্লাহ নাজিল করেছেন সেভাবে পড়া, কোন শব্দের অর্থ বিকৃত না করা...”

অন্যান্য অনেক হাদীস থেকেও জানা যায় কুরআন পড়ার সাথে সাথে এর উপর আমল করতে হয়। সাহাবীরা তাই ধীর গতিতে কুরআন পড়তেন যেন যা পড়লেন তা হৃদয়ে প্রবেশ করে এবং এর উপর আমল করা অভ্যাস করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, “কেয়ামতের দিন কুরআন ও এর উপর আমলকারীদের আনা হবে...” (বুখারী)

অর্থাৎ কুরআন সুপারিশ করবে তাদের জন্য যারা তাকে ‘যথাযথভাবে পাঠ’ করে।

আমরা পরীক্ষার জন্য কোন কিছু পড়তে হলে খুব ভাল করে পড়ি, মুখস্থ করি, রেফারেন্স ঘাঁটি, নোট করি। কিন্তু কুরআন, যা অন্যান্য সকল গ্রন্থের থেকে মর্যাদাবান সেটা পাঠ করতে গিয়ে ঘন্টায় নব্বই মাইল বেগে পড়ে তা শেষ করাই আমাদের লক্ষ্য হয়ে পড়ে। সাহাবীরা কুরআনের সাথে এরকম আচরণ করেননি, তারা জীবন যুদ্ধে পরীক্ষা দেবার মানসেই কুরআন অধ্যয়ন করেছেন।

- **কুরআন পাঠে সতর্কতা:** কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে অনেকেই অজ্ঞানতাবশত ভুল করেন এবং লাভের পরিবর্তে ক্ষতিগ্রস্ত হন। মুসলিমরা আজ কনফারেন্স ও মিটিং আরম্ভ করতে, বিয়ের অনুষ্ঠানে, টিভি ও রেডিওর অধিবেশন শুরু ও সমাপ্তিতে এবং মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআন পাঠ করছে। এসব দেখে অনেকের মনে হতে পারে, কুরআন নাজিলের মূল কারণ বুঝি নেকী লাভ করা। কুরআন পাঠে বরকত অবশ্যই আছে, কিন্তু যে শুধু বরকতটা লাভ করতে চায় কিন্তু কুরআন কি বলে তার প্রতি খেয়াল করেনা তার বেলায় কি হবে? ইমাম গাজ্জালীর মতে এরূপ ব্যক্তি শুধু জিহ্বাই নাড়ালো কিন্তু কুরআন পড়ে লাভবান হলোনা। কেউ যখন আল্লাহর অবাধ্যতার শাস্তির আয়াত পড়ে তখন তার মনে কি ভয় জাগা উচিত না? ‘কুকুর হইতে সাবধান’ সাইনবোর্ড পড়েও যে নির্বিকার চিণ্ডে এগিয়ে যায় তার সাইনবোর্ড পড়ে কি লাভ হল এবং তার পরিণতিই বা কি হবে?

আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেছেন, “হয়ত কেউ কুরআন পড়ছে আর কুরআন তাকে লানত দিচ্ছে।”

বনী ইসরাইলরাও আল্লাহ প্রদত্ত তাওরাতকে এভাবে শিকেয় তুলে রেখেছিল, আল্লাহ তাই তাদের সম্পর্কে বলেছেন,

مَثَلُ الَّذِينَ خُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ
أَسْفَارًا

“যাদেরকে তাওরাত দেয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা তার অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধা, যে পুস্তক বহন করে (কিন্তু পুস্তক থেকে লাভবান হয়না)।” (সূরা আল জুমুআহ, ৬২:৫)

দ্বিতীয় যে ভুলটা আমরা করি তা হল না জেনে কথা বলা। কুরআন, সুন্নাহ, শরীয়ত ইত্যাদি সম্পর্কে না জেনে কথা বলা খুবই বিপদজনক। ইবনুল কায়্যিমের মতে “এটি সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন গুনাহ।” আমরা যখন কুরআনের কোন আয়াতের ব্যাপারে মন্তব্য করব তখন আমাদের ভাল করে জেনে বুঝে কথা বলতে হবে। অনেকে ভাবতে পারেন পুরো কুরআন আমার পড়া আছে তাই

এখন আমি কুরআন ব্যাখ্যাকারীদের সমালোচনা করতে পারি- এ ধরনের চিন্তা ভাবনা করার আগে আল্লাহর সতর্কবাণী মনে রাখা দরকার:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ
 ⑧ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ
 وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ

“কিছু মানুষ জ্ঞান, প্রমাণ ও উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে। সে পার্শ্ব পরিবর্তন করে (মুখ ফিরিয়ে নিয়ে) বিতর্ক করে, যাতে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দেয়। তার জন্য দুনিয়াতে লাঞ্ছনা আছে এবং কেয়ামতের দিন আমি তাকে দহন যন্ত্রণা আশ্বাদন করাব।” (সূরা হাজ্জ, ২২:৮-৯)

বিদআত সৃষ্টিকারীরা তাদের সপক্ষে কুরআন থেকে প্রমাণ নিয়ে আসে কিন্তু তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا
 حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا
 يُفْلِحُونَ

“তোমাদের মুখ থেকে সাধারণত যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে তেমনি করে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলোনা যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয় যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, তাদের মঙ্গল হবেনা।” (সূরা আন নাহল, ১১৬)

আমরা যদি বলি ‘এখানে আল্লাহ বলতে চেয়েছেন..’, ‘আল্লাহ যা বলছেন তার অর্থ হল..’ তখন সতর্ক থাকতে হবে আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে কথা বলছি। কুরআনের কোন আয়াতকে আমরা নিজেদের মন যেরকম চায় সেরকম করে ব্যাখ্যা করতে পারিনা। না জেনে মন্তব্য করাকে আল্লাহ শিরকের মত ভয়াবহ গুনাহের সাথে উল্লেখ করেছেন :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ
 الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا
 لَا تَعْلَمُونَ

“আপনি বলে দিন: আমার পালনকর্তা শুধু অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন- যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গোনাহ, অন্যায় অত্যাচার, আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে

শরীক করা তিনি যার কোন সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জান না।” (সূরা আল আরাফ, ৭:৩৩)

আবু বকর (রা) এর মত প্রথম সারির সাহাবী এ প্রসঙ্গে বলেছেন, “আমি যদি কুরআন সম্পর্কে নিজের মতামত দিই বা না জেনে কথা বলি তবে কোন মাটি আমাকে জায়গা দেবে আর কোন আকাশই বা আমাকে ছায়া দেবে?”

কুরআন পাঠের সময় আমরা এর আয়াত নিয়ে চিন্তা করব কিন্তু নিজেদের আন্দাজ অনুমানের উপর নির্ভর না করে তাফসীরও জেনে নেব। বাংলায় বর্তমানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে তাফসীর ও সংক্ষিপ্ত টীকাসহ কুরআন পাওয়া যায়। কোন তাফসীর নির্ভরযোগ্য কিনা তা কিভাবে বুঝবেন? যদি দেখেন তাফসীরবিদ হাদীস, সীরাত ও সাহাবাদের ব্যাখ্যা ও আমল থেকে তাফসীর করছেন তবে বুঝবেন সেটি উত্তম তাফসীর গ্রন্থ। সুখ্যাত তাফসীর গ্রন্থের মধ্যে তাফসীর ইবনে কাসীর, মা’আরেফুল কোরআন, তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে উসমানী, বয়ানুল কুরআন বাংলায় অনূদিত হয়েছে। বর্তমান কালের উল্লেখযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ হচ্ছে সাইয়েদ কুতুব শহীদেদ ফি যিলালিল কুরআন, আবুল আলা মওদুদীর তাফহীমুল কুরআন। এসব সুদীর্ঘ তাফসীর পড়ার সময় না থাকলে পড়তে পারেন সংক্ষিপ্ত মা’আরেফুল কুরআন। তাফসীরের সাথে যোগ করা যেতে পারে কুরআনে বিজ্ঞান ও সীরাত (যেমন সীরাতে ইবনে হিশাম) সংক্রান্ত রচনাবলী।

আমরা কুরআনের অনুবাদ পড়ে যদি ভাবি সব জেনে গেছি তবে ভুল করব। অনুবাদ মানুষের করা, তাই তা নিখুঁত হয়না, কিন্তু আরবী কুরআন নির্ভুল। আল্লাহ কুরআনের জন্য যেসব শব্দ নির্বাচন করেছেন তাদের গভীর অর্থ আছে যা একটি অনুবাদে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই আমাদের আরবী শিখতে হবে। কুরআন আরবীতে নাজিল হয়েছে, রাসূলুল্লাহর (সা) ভাষা ছিল আরবী, আখেরাতের ভাষাও আরবী। কুরআনকে বুঝতে হলে আরবী জানা খুবই জরুরী। এই দুনিয়ায় সফল হওয়ার জন্য ইংরেজি শিখতে আমাদের চেষ্টার ত্রুটি নেই কিন্তু আমরা এই দুনিয়া ও পরের দুনিয়ার সাফল্যের জন্য আরবী কেন শিখি না? আল্লাহ আরবীকে কুরআনের ভাষা হিসেবে মনোনীত করেছেন, আল্লাহর পছন্দের ভাষা আরবী। আমরা ফরাসী, জাপানি, জার্মানের মত এমন ভাষা শিখতে আগ্রহ দেখাই যেগুলো হয়ত আমাদের জীবনে কোন কাজেই আসবেনা, অথচ কুরআনকে বুঝার জন্য আরবী শিখলে তা আমাদের আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করবে; আমরা কি এ ব্যাপারে একটু এগিয়ে আসতে পারিনা?

শেষ কথা: আমাদের সমগ্র আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল একটিই, মুসলিমদের কুরআনের কাছে ফিরিয়ে আনা এবং কুরআন পাঠ থেকে বেশি বেশি উপকৃত হওয়া। গ্রেট ব্রিটেনের চারবার নির্বাচিত প্রধান মন্ত্রী উইলিয়াম ই. গাম্ভস্টোন পার্লামেন্টে বলেছিলেন, “যতদিন কুরআন আছে, ইউরোপ ততদিন ইসলামী পূর্বাঞ্চলকে জয় করতে পারবেনা।” আলজেরিয়ায় ফরাসী উপনিবেশের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে সেখানকার ফরাসী গভর্নরের বক্তব্য ছিল, “আমরা যদি তাদের উপর বিজয়ী হতে চাই তবে আরবী কুরআনকে তাদের (আলজেরিয়ার মুসলিমদের) মধ্য থেকে সরিয়ে দিতে হবে এবং আরবী ভাষাকে তাদের মুখ থেকে বিতাড়িত করতে হবে।” ইসলামের অনেক শত্রুই এর থেকেও গুরুতর পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে: কুরআনকে সরিয়ে দেয়ার দরকার নেই, কুরআন যেন মুসলিমদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে না পারে সেটা নিশ্চিত করাই যথেষ্ট। আমরা তাই আজ ভেবে দেখি আমরা কুরআন থেকে কত দূরে, আল্লাহর

সাহায্য কি কখনও আমাদের কাছে আসবে যখন কিনা আমরা কাফিরদের পরিকল্পনা মত চলতে শুরু করেছি?

কুরআন না বুঝার জন্য বিচার দিবসে আমাদের কৈফিয়ত চাওয়া হলে আমরা কি উত্তর দিব? আল্লাহ কুরআনে বলে দিয়েছেন সে সময় রাসুলুল্লাহ (সা) বলবেন,

وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

“(বিচারের দিন) আল্লাহর রাসূল (অভিযোগ করে) বলবেন: হে প্রভু! আমার লোকেরা এই কুরআনকে পরিত্যক্ত বস্তুতে পরিণত করেছিল।” (সূরা আল ফুরকান ২৫:৩০)

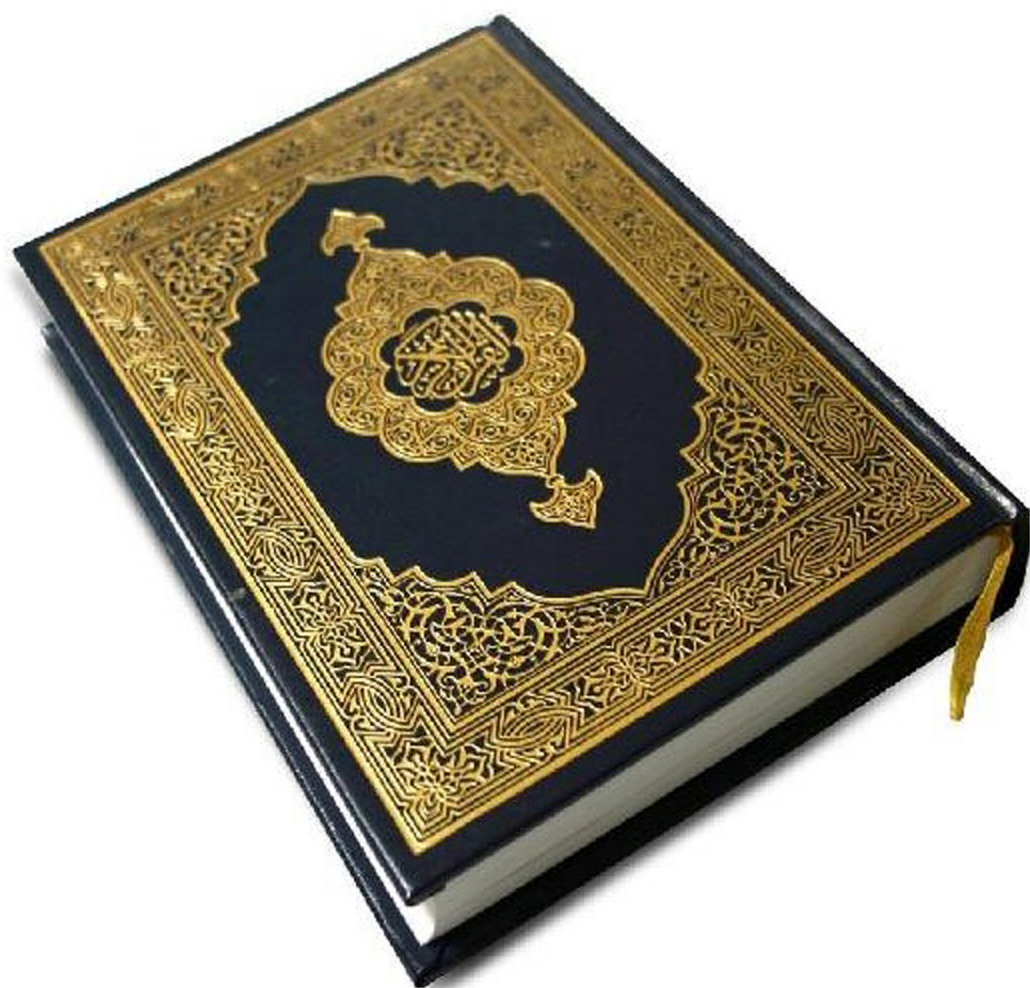
আমরা কি সেই অভিযুক্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাচ্ছি? কিন্তু কেন? শেষ করার আগে আল্লাহর একটি সতর্কবাণী স্মরণ করিয়ে দিতে চাই,

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ
وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ
فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ۝۱۱﴾

“যারা মুমিন, তাদের জন্য কি আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তরকে বিনয়াবনত করার সময় আসেনি? তারা যেন তাদের মত না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, এরপর তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী।” (সূরা হাদীদ, ৫৭:১৬)

গ্রন্থপঞ্জী:

- How to Approach and Understand the Quran, Jamal al-Din M. Zarabozo
- কুরআন অধ্যয়ন সহায়িকা, খুররম মুরাদ
- তাফহীমুল কুরআনঃ ১ম খন্ড, আবুল আ'লা মওদুদী
- কুরআন পড়বেন কেন? কিভাবে?, আবদুস শহীদ নাসিম



Whoever holds fast to God, he has been guided onto the Straight Path.
[Al Imran 3: 101]